Development Compilation
Bangladesh Institute of Professional Studies
https://bips.bd/journal
ISSN: 2072-3334 (Print), ISSN: 2663-1547 (Online)

Volume 19 | Issue 1 | Page: 316-328 | July 20, 2026 | Article |

বাংলার বারো ভূঁইয়া: ঈসা খাঁর জীবন, ভাটি অঞ্চলের রাজনৈতিক প্রতিরোধ ও জঙ্গলবাড়ির ঐতিহাসিক গুরুত্ব

Baro-Bhuiyans of Bengal: The Life of Isa Khan, Political Resistance in Bhati, and the Historical Significance of Jangalbari

Md. Riyad Ahamed[1]

1. Assistant Professor, Department of History, Kishoreganj Government Mohila College, Kishoreganj, Bangladesh. Email: riyadahamed1986@gmail.com

HOW TO CITE
Ahamed, M. R. (2026). Baro-Bhuiyans of Bengal: The life of Isa Khan, political resistance in Bhati, and the historical significance of Jangalbari. *Development Compilation, 19*(1), 316–328. https://bips.bd/journal

ARTICLE HISTORY
Received: 26 June 2026
Revised: 8 July 2026
Accepted: 13 July 2026
Available online: 20 July 2026

© 2026 The Author(s). Published by **Development Compilation**, Bangladesh Institute of Professional Studies. This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

CC BY 4.0

প্রতিপাদ্যসার:

এই প্রবন্ধে ঈসা খাঁর জীবন ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব, ভাটি অঞ্চলে বারো ভূঁইয়াদের প্রতিরোধ এবং বর্তমান কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ির ঐতিহাসিক গুরুত্বকে সমন্বিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণাটি দেখায় যে ঈসা খাঁর সাফল্যকে কেবল ব্যক্তিগত সামরিক দক্ষতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যথেষ্ট নয়; নদী, হাওর, জলাভূমি, মৌসুমি নৌপথ, দুর্গব্যবস্থা এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেটওয়ার্ক তাঁর প্রতিরোধের কার্যকারিতাকে গঠন করেছিল। জঙ্গলবাড়িকে তাই একক কোনো ‘রাজধানী’ হিসেবে নয়, বরং ভাটি অঞ্চলের বৃহত্তর সামরিক-রাজনৈতিক ও জলভূমি-নির্ভর ভূদৃশ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে। গবেষণায় দলিলভিত্তিক ইতিহাস, প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য এবং লোকস্মৃতিকে পারস্পরিক যাচাইয়ের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়েছে। একই সঙ্গে জঙ্গলবাড়ির ঐতিহ্য সংরক্ষণে documentation, institutional management, community participation, environmental protection, responsible tourism এবং climate resilience-কে সমন্বিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখানো হয়েছে।

মূলশব্দ: Domestic Violence, Women’s decision making, Age, Small business, Work in rural areas.

১. ভূমিকা

বাংলার ইতিহাসে মুঘল সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ একটি দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। ১৫৭৬ সালের রাজমহলের যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলায় আফগান রাজনৈতিক আধিপত্যের অবসান ঘটলেও মুঘলদের পক্ষে সমগ্র বাংলায় তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। বিশেষত পূর্ববাংলার নদীবহুল ও জলাভূমিপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে স্থানীয় ভূস্বামী ও সামরিক নেতারা নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখেন।এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসে 'ভাটি' একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক ধারণা। অসংখ্য নদী, শাখানদী, বিল, হাওর ও জলাভূমির কারণে ভাটি ছিল স্বতন্ত্র ভূপ্রকৃতির অঞ্চল। এই ভূপ্রকৃতি স্থানীয় রাজনৈতিক শক্তিকে এমন সামরিক সুবিধা প্রদান করেছিল, যা বহিরাগত বৃহৎ স্থলবাহিনীর জন্য ছিল যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং।এই পরিস্থিতিতে ঈসা খাঁর আবির্ভাব ঘটে। তিনি স্থানীয় ভূস্বামীদের রাজনৈতিক শক্তিকে সংগঠিত করে মুঘল কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র সোনারগাঁও ও ভাটি অঞ্চলকে ঘিরে বিকশিত হলেও তাঁর প্রভাব বৃহত্তর পূর্ববাংলায় বিস্তৃত হয়।এই গবেষণায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়িকে। জঙ্গলবাড়ি দুর্গ বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার জঙ্গলবাড়ি গ্রামে অবস্থিত। দুর্গের চারপাশের পরিখা এবং নদীপথের সঙ্গে এর সম্পর্ক প্রমাণ করে যে এর অবস্থান সামরিক প্রতিরক্ষার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী ছিল

বারো ভূঁইয়া:

বারো ভূঁইয়া বাংলার স্থানীয় প্রধান ও জমিদার, যাঁরা আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মুঘলবিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। বারো-ভূঁইয়া শব্দটির অর্থ বারোজন ভূঁইয়া। তবে কারা ছিলেন এ বারোজন ভূঁইয়া তা বহুদিন পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় নি। প্রকৃতপক্ষে বাংলায় আফগান শাসনামল ও মুঘল শক্তির উত্থানের মধ্যবর্তী সময়ে এদেশের বিভিন্ন এলাকা বহু সামরিক প্রধান, ভূঁইয়া এবং জমিদারদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। তাঁরা কখনও যৌথভাবে এবং বেশিরভাগ সময় পৃথকভাবে মুঘল আগ্রাসন প্রতিহত করেছিলেন এবং স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন শাসকরূপে তাঁদের নিজ নিজ এলাকা শাসন করেছিলেন। সেখানে কোন কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না, কিংবা থাকলেও সেটা ছিল নামমাত্র। এ অবস্থায় বহু ভূঁইয়া বিদ্রোহ করেছিলেন। সমগ্র বাংলাকে বিবেচনায় নিলে ভূঁইয়াদের সংখ্যা বারোর চেয়ে অনেক বেশি ছিল।অনেকেই মনে করেন যে, বারো ভূঁইয়া শব্দটি নির্ভুলভাবে বারোজন ভূঁইয়া বা প্রধানকে বোঝায় না; বহু সংখ্যক বুঝাতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। হিন্দুদের কাছে বারো সংখ্যাটি ছিল পবিত্র। কোন কোন ক্ষেত্রে বারো সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়েছিল তা খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে পণ্ডিতগণ নানাধর্মের কাহিনীগুলি পরীক্ষা করেন। তাঁরা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য যারা যুদ্ধ করেছিলেন তাদের বোঝাতে বারো ভূঁইয়া শব্দটি ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের মুক্তিকামী যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল বারোর চেয়ে অনেক বেশি। পরবর্তীকালে অবশ্য এ মতবাদ সংশোধন করে বলা হয় যে, যারা মুঘলদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন শুধু তারাই বারো ভূঁইয়া নামে পরিচিত। তাহলে মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াইকারীদের সংখ্যা ছিল বারোর অধিক। ফলে এ দলও বারো ভূঁইয়াদের শনাক্ত করতে ব্যর্থ হন।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বারো ভূঁইয়াদের পরিচয়ের প্রশ্নটি সতর্কতার সঙ্গে নতুনভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং মোটামুটি সন্তোষজনকভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। আধুনিক পণ্ডিতগণ লক্ষ্য করেন যে, আফগান শাসনের গোলযোগপূর্ণ সময়ে মুঘল সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের বাংলা বিজয়ের প্রক্রিয়া-কালে বারো ভূঁইয়াগণ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। ফলে ‘আকবরনামা’র রচয়িতা আবুল ফজল এবং ‘বাহারিস্তান-ই-গায়েবীর রচয়িতা মির্জা নাথানের মতো মুঘল ঐতিহাসিকদের দ্বারা বারো ভূঁইয়াগণ যথাযথভাবে আলোচিত হয়েছেন। তাঁরা উভয়েই বারো ভূঁইয়াদের বোঝাতে সংখ্যাবাচক ‘ইছনা-আশারা’ (বারো) শব্দটি ব্যবহার করেছেন; এর থেকে বোঝা যায় যে, বারো ভূঁইয়া শব্দটি কোন নাম নয়, বরং এটি ভূঁইয়াদের সঠিক সংখ্যা নির্দেশ করে। তাঁরা স্পষ্টভাবে এও বলেন যে, বারোজন ভূঁইয়া (বারো ভূঁইয়া) ছিলেন ভাটি এলাকার লোক এবং ভাটিতেই তাঁদের উত্থান ঘটেছিল। কিন্তু ভাটির শনাক্তকরণও সহজ কাজ নয়।

ইউরোপীয় লেখকদের বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের কারণে পূর্বতন পণ্ডিতরাও ভাটির শনাক্তকরণ নিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে ছিলেন। বারো ভূঁইয়ারা সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং জাহাঙ্গীরের সিংহাসনআরোহণের কয়েক বছরের মধ্যেই তারা আত্মসমর্পণ করেন। কাজেই মুঘল ইতিহাসের, প্রধানত আকবরনামা, আইন-ই-আকবরী এবং বাহারিস্তান-ই-গায়েবীর সাহায্য নিয়ে (বারো ভূঁইয়াদের) ভাটির শনাক্তকরণ করা যেতে পারে। বাংলায় ভাটি শব্দটি সাধারণতঃ নিম্ন অঞ্চলকে বোঝায় এবং এ বিবেচনায় বাংলার সমগ্র নিম্ন অঞ্চলই ভাটি। এটি নদীমাতৃক দেশ এবং এর অধিকাংশ এলাকাই বছরের অর্ধেকের চেয়ে বেশি সময় প্লাবিত থাকে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রের মতো অতিবৃহৎ নদীগুলি এবং তাদের অসংখ্য শাখা সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সে অঞ্চল প্লাবিত করে।

সুতরাং আধুনিক পণ্ডিতগণ বাংলার বিভিন্ন নিম্ন অঞ্চলকে ভাটিরূপে শনাক্তকরণের প্রস্তাব করেন। কারও কারও মতে ভাগীরথী থেকে মেঘনা পর্যন্ত সমগ্র নিম্ন অঞ্চলই হচ্ছে ভাটি। আবার কেউ কেউ তিস্তা, করতোয়া, চন্দ্রদ্বীপ, বাকলা প্রভৃতি এলাকাকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বারো ভূঁইয়া ও মুঘলদের মধ্যকার রণক্ষেত্রের কথা মনে রাখলে এবং আকবরনামা ও বাহারিস্তান-ই-গায়েবীতে প্রদত্ত যুদ্ধবিগ্রহের বিস্তারিত বিবরণের ভিত্তিতে বারো ভূঁইয়াদের অঞ্চলে সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন এবং শক্তিশালী হয়েছিলেন সেই ভাটির সীমানা নির্ধারণ করা যায়। এ ভাটি অঞ্চল পশ্চিমে ইছামতী নদী, দক্ষিণে গঙ্গানদী, পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্য এবং উত্তরে আলপসিংহ পরগনার (বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা) উত্তর-

পূর্ব দিক থেকে বানিয়াচং (বৃহত্তর সিলেট) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং তিনটি বড় নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা ও তাদের অসংখ্য শাখানদী দিয়ে ধৌত ও বেষ্টিত ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা এবং সিলেটের নিম্ন অঞ্চল নিয়ে আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে ভাটি অঞ্চল গঠিত ছিল। বারো ভূঁইয়াগণ এ এলাকায় শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন এবং জাহাঙ্গীরের আমলে ইসলাম খান চিশতি কর্তৃক আক্রমণপণ করতে বাধ্য হওয়া পর্যন্ত তাঁরা মুঘলদের প্রতিহত করেছিলেন।

মুঘল ঐতিহাসিক আবুল ফজল ও মির্জা নাথান উভয়েই ভূঁইয়াদের সংখ্যা বারো বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটি মনে রাখতে হবে যে, মধ্যবর্তীকালে তাঁদের কারও কারও মৃত্যু হওয়ায় আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলের বারো ভূঁইয়াগণ সকল ক্ষেত্রে একই ছিলেন না। উদাহরণস্বরূপ আকবরের বিরুদ্ধে লড়াইরত ঈসা খান তাঁর রাজত্বকালেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র মূসা খান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে জাহাঙ্গীরের আমলে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ইতোমধ্যে কিছু পরগনার মালিকানাও বদল হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, আকবরের রাজত্বকালে চাঁদ রায় ও কেদার রায় ছিলেন বিক্রমপুর ও শ্রীপুর-এর জমিদার, কিন্তু জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সম্ভবতঃ এ পরিবার বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং একারণে এ পরগনাগুলি মূসা খানের দখলে দেখতে পাওয়া যায়। আকবরনামা'য় প্রাপ্ত ভাটিতে মুঘলদের যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ অনুযায়ী ভূঁইয়াদের নিম্নলিখিত তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে: (১) ঈসা খান মসনদ-ই-আলা, (২) ইব্রাহিম নরল, (৩) করিমদাদ মুসাজাই, (৪) মজলিস দিলওয়ার, (৫) মজলিস প্রতাপ, (৬) কেদার রায়, (৭) শের খান, (৮) বাহাদুর গাজী, (৯) তিলা গাজী, (১০) চাঁদ গাজী, (১১) সুলতান গাজী, (১২) সেলিম গাজী, (১৩) কাসিম গাজী।

বাহারিস্তান-ই-গায়েবীতে মূসাখান ও তাঁর বারোজন মিত্র জমিদারের নাম পাওয়া যায়। এদের নাম নিম্নরূপ: (১) মূসা খান মসনদ-ই-আলা, (২) আলাউল খান, (৩) আবদুল্লাহ খান, (৪) মাহমুদ খান, (৫) বাহাদুর গাজী, (৬) সোনা গাজী, (৭) আনোয়ার গাজী, (৮) শেখ পীর, (৯) মির্জা মুনিম, (১০) মাধব রায়, (১১) বিনোদ রায়, (১২) পালোয়ান, (১৩) হাজী শামসুদ্দীন বাগদাদী। একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আবুল ফজল ও মির্জা নাথান উভয়েই তাঁদের তালিকায় তেরোজন করে নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং বস্তুতঃ আবুল ফজল এবং মির্জা নাথান দুজনই বারোজন জমিদারকে তাঁর অধীনে দেখিয়েছেন। অন্যত্র মির্জা নাথান উল্লেখ করেন, 'মূসাখান ও তাঁর বারোজন জমিদার মিত্র'। ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে দু'শত বছরের পুরানো স্বাধীন সালতানাতের পতনের পর পূর্ব বাংলায় বিরাজমান বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগে বারো ভূঁইয়াগণ শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন। শেরশাহ সুলতান গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ-এর রাজধানী গৌড় জয় করে তাঁর প্রশাসকদের হাতে ন্যস্ত করেন কিন্তু তিনি বাংলার সর্বত্র তাঁর ক্ষমতা সংহত করতে পারেন নি। তাঁর বিরুদ্ধে উচ্ছেদকৃত শাসকদের সমর্থকদের কমপক্ষে তিনটি বিদ্রোহের দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলার নদীবিধৌত এলাকা সব সময়ই কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য একটি সমস্যা ছিল। এ সমস্যা সমাধানকল্পে শেরশাহ বাংলাকে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট ইউনিটে বিভক্ত করেন। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ছোট ছোট এসব ইউনিটের শাসকদের বিদ্রোহ করার কোন শক্তি না থাকায় আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বিকেন্দ্রীকরণের নীতিকে অভিনন্দিত করেন। কিন্তু বিকেন্দ্রেকরণের কুফলও ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র ইউনিটগুলির শাসকদের বিদ্রোহ করার শক্তি না থাকলেও বিদ্রোহীরেদ প্রতিরোধ করার কোন শক্তিও তাদের ছিল না। শেরশাহের বিকেন্দ্রীকরণ নীতির এ কুফল তাঁর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় কয়েকটি বিদ্রোহ দ্বারা প্রমাণিত। আফগান ঐতিহাসিকগণ এ অবস্থাকে মুলুক-উত তাওয়ায়েফ রূপে আখ্যায়িত করেছেন, যার অর্থ বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য ও বিশ্বখন্ডায়ন।শামসুদ্দীন মুহম্মদ শাহ গাজী ও অন্যান্য আফগান শাসকদের অধীনে স্বাধীন শূর বংশের প্রতিষ্ঠা এ বিশ্বখন্ডায়ন ও বিশৃঙ্খল অবস্থার অবসান ঘটায় নি। এ আমলে তাজখান কররানী আদিল শাহের (আদালী) দিল্লির দরবার থেকে পালিয়ে বাংলায় চলে আসেন এবং এদেশে লুটপাট চালান। বাংলায় কর্মরত তাঁর ভাই সুলায়মানের সঙ্গে যোগ দিয়ে বাংলার রাজনীতিতে তিনি শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে তিনি শূর বংশের গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন এবং আরও পরে কররানী বংশের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। দাউদ খান কররানী-র মৃত্যু এবং মুঘলদের দ্বারা রাজধানী তান্ডা অধিকৃত হওয়ার পরে মানসিংহ কর্তৃক উড়িষ্যা থেকে বিতাড়িত হয়ে খাজা উসমান ও তাঁর ভাইয়েরা বাংলায় আসেন। সাতগাঁও ও ভূষণার মধ্য দিয়ে তাঁরা বুকাঈনগরে (বর্তমান বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায়) আসেন এবং নিজেদের জন্য একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এটা স্পষ্ট যে, স্বাধীন সালতানাতের পতনের পর (১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) এবং বিশেষত শেরশাহ এর প্রশাসন-বিকেন্দ্রীকরণের পর পূর্ব বাংলার ভাটি অঞ্চলে বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং সংহতি নাশক শক্তি বিরাজ করছিল। এই বিশৃঙ্খল সময়ে বারো ভূঁইয়াগণ শক্তি সঞ্চয় করেন এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। দু'শত বছর স্থায়ী বাংলার স্বাধীন সালতানাতের উত্তরাধিকারী ছিলেন বারো ভূঁইয়াগণ।বারো ভূঁইয়াগণ কোন রাজপরিবারের বংশধর ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন জমিদার বা জমির মালিক এবং দেশপ্রেমিক। অদম্য সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে তাঁরা দীর্ঘ তিন যুগ ধরে মুঘল আগ্রাসন প্রতিহত করেছিলেন। ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দের পর ইসলাম খান তাঁদেরকে বশ্যতাস্বীকার করতে বাধ্য করেন। এরপর বারো ভূঁইয়া নামটি শুধু লোককাহিনী এবং গাঁথায় থেকে যায়। (আবদুল করিম) ঈসা খান (১৫২৯-১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) সরাইলের জমিদার, ভাটি অঞ্চলের শাসক এবং বারো ভূঁইয়াদের নেতা। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে তাঁর জন্ম।

ঈসা খানের পিতামহ বাইশ রাজপুত সম্প্রদায়ভুক্ত ভগীরথ প্রথমে অযোধ্যা থেকে বাংলায় আসেন এবং বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ-এর অধীনে দেওয়ান হিসেবে চাকরি গ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র কালিদাস গজদানী পিতার দেওয়ান পদ লাভ করেন। পরবর্তীতে কালিদাস ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সোলায়মান নাম ধারণ করেন। সোলায়মান সুলতানের কন্যা সৈয়দা মোমেনা খাতুনকে বিয়ে করেন এবং সরাইলের জমিদারি লাভ করেন। এ সরাইলেই সোলায়মানের পুত্র ঈসা খান জন্ম গ্রহণ করেন।সুলতান গিয়াসউদ্দীন মাহমুদের মৃত্যুর পর জামাতা সোলায়মান খান নিজেকে বৈধ উত্তরাধিকারী দাবি করে নব প্রতিষ্ঠিত আফগান শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এ সময় তিনি প্রায় স্বাধীনভাবেই ভাটি অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন এবং তাঁর রাজ্য শাসনের কেন্দ্র বিন্দু ছিল সরাইল। ১৫৪৫ খ্রিষ্টাব্দে শেরশাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করে বাংলাকে একটি একক প্রশাসনিক শৃঙ্খলার মধ্যে আনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু সোলায়মান খান ইসলাম শাহের ব্যবস্থা মেনে নিতে অস্বীকার করলে ইসলাম শাহ তাজ

খান ও দরিয়া খান নামে দু'জন সেনাপতিকে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সোলায়মান খান তাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পরাজিত ও নিহত হন এবং তার দুই পুত্র ঈসা ও ইসমাইলকে বন্দি করে ইরানি বণিকদের নিকট দাসরূপে বিক্রি করে দেওয়া হয়।১৫৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তাজ খান কররানী বাংলা ও বিহারের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করলে, ঈসা খানের চাচা কুতুব খান তার অনুগ্রহভাজন হন এবং দরবারি কাজে নিযুক্তি লাভ করেন। এ সময়ে তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বয়ের (ঈসা ও ইসমাইল) খোঁজ পেয়ে অর্থের বিনিময়ে ইরানি বণিকের কাছ থেকে তাদের মুক্ত করে আনেন।ঈসা খান দেশে ফিরে এসে চাচা কুতুব খানের প্রচেষ্টায় তার পিতার সরাইলস্থ জমিদারি লাভ করেন। ১৫৭৫ সালে তাজ খান কররানীর মৃত্যুর পর ঈসা খান আফগান শাসকদের মোঘল আক্রমণ মোকাবেলায় সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে আসছিলেন। ১৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ত্রিপুরার রাজা উদয়মানিক্যের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম অভিযানে দাউদ খানকে সাহায্য করেন। ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সোনারগাঁও-এর পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে মোঘল নৌবহরকে বিতাড়িত করতে দাউদখানের সেনাপতিকে সাহায্য করেন।১৫৭৬ সালে রাজমহলের নিকটবর্তী অগমহলের যুদ্ধে দাউদ খান কররানী পরাজিত ও নিহত হলে কার্যত বাংলায় আফগান শাসনের অবসান হলেও ঈসা খান এ সময়ে প্রায় স্বাধীনভাবেই তাঁর রাজ্য পরিচালনা করছিলেন। কিন্তু তিনি যথার্থভাবেই অনুধাবন করেন যে, তিনি নিজের সীমিত শক্তি দিয়ে একা মোঘলদের মোকাবিলা করতে পারবেন না। তাই তিনি পার্শ্ববর্তী জমিদার ও আফগান দলপতিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং তাদের সঙ্গে মোঘল বিরোধী রাজনৈতিক ও সামরিক মৈত্রী গঠন করেন। তিনি প্রতিবেশী ত্রিপুরা ও কামরূপ এর রাজা যথাক্রমে অমরমাণিক্য ও রঘুদেবের সঙ্গেও বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন করেন। এ ছাড়াও ঈসা খান তার সামরিক শক্তির প্রধান অবলম্বন রণতরীগুলির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করেন।

২. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ঈসা খাঁর জীবন, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং জঙ্গলবাড়ির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা।

বিশেষ উদ্দেশ্য হলো

১. ঈসা খাঁর পারিবারিক, রাজনৈতিক , . মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে সামরিক সাফল্যের পটভূমি বিশ্লেষণ করা;

২. জঙ্গলবাড়ির সামরিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ,লোকঐতিহ্যগত ও রাজনৈতিক গুরুত্ব নির্ণয় করা;

৩. ভাটি অঞ্চলের বারো ভূঁইয়াদের রাজনৈতিক কাঠামো ও ঈসা খাঁ কীভাবে আঞ্চলিক রাজনৈতিক নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন?

৩. সাহিত্য পর্যালোচনা:

ঈসা খাঁ ও বারো ভূঁইয়া নিয়ে ইতিহাসচর্চার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সামরিক প্রতিরোধের ওপর জোর। আবুল ফজলের আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরি মুঘল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ও সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাংলার পরিস্থিতি তুলে ধরে। অন্যদিকে মির্জা নাথানের বাহারিস্তান-ই-গায়েবী পূর্ববাংলার সামরিক অভিযান, স্থানীয় প্রধান এবং ভৌগোলিক বাস্তবতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়। এসব উৎসের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য রয়েছে। মুঘল দরবারি বয়ানে স্থানীয় প্রতিরোধ অনেক সময় সাম্রাজ্যিক শৃঙ্খলার সমস্যা হিসেবে প্রতিভাত হলেও স্থানীয় ইতিহাসের আলোকে একই ঘটনা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা যায়। ফলে উৎসসমালোচনা ছাড়া কোনো একটি বয়ানকে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। (Abu'l-Fazl, 1877; Nathan, 1936) নলিনী কান্ত ভট্টশালীর Bengal Past and Present-এ প্রকাশিত গবেষণা বারো ভূঁইয়াদের রাজনৈতিক ভূমিকা বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। তাঁর কাজ থেকে বোঝা যায় যে বাংলার স্থানীয় প্রধানদের সম্পর্ক ছিল পরিবর্তনশীল এবং মুঘল শক্তির সঙ্গে তাদের অবস্থান একরৈখিক ছিল না। পরবর্তী গবেষণায়ও বারো ভূঁইয়া ধারণার সদস্যসংখ্যা ও কাঠামো নিয়ে বিতর্ক দেখা যায়। এই বিতর্কের গুরুত্ব হলো, 'বারো'কে কেবল একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার রাজনৈতিক জোট হিসেবে ধরলে স্থানীয় ক্ষমতার পরিবর্তনশীলতা আড়াল হয়। তাই এই গবেষণায় বারো ভূঁইয়াকে একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পরিচয় এবং আঞ্চলিক শক্তির সমষ্টি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। (Bhattasali, 1928-1929) আধুনিক বাংলা ইতিহাসের গবেষণায় Abdul Karim-এর কাজ মুঘল আমলের প্রশাসন, স্থানীয় জমিদার এবং আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তির সম্পর্ক বোঝাতে সহায়ক। Richards-এর Mughal Empire সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামো ও বিস্তারের বৃহত্তর প্রেক্ষাপট দেয়। Eaton-এর The Rise of Islam and the Bengal Frontier আবার পূর্ববাংলার পরিবেশ, কৃষি সম্প্রসারণ ও বসতির দীর্ঘমেয়াদি রূপান্তরকে গুরুত্ব দেয়। এই তিন ধরনের গবেষণা একত্রে পড়লে বোঝা যায় যে ভাটি অঞ্চলের প্রতিরোধ কেবল সামরিক ইতিহাস নয়; এটি পরিবেশ, কৃষি, জনবসতি ও আঞ্চলিক ক্ষমতার দীর্ঘমেয়াদি ইতিহাসের অংশ। (Abdul Karim, 1992; Richards, 1993; Eaton, 1996)। সাম্প্রতিক পরিবেশগত ইতিহাসের আলোচনায় বাংলার নদীকে একটি সক্রিয় ঐতিহাসিক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। Bhattacharya-এর গবেষণা দেখিয়েছে যে নদীর প্রবাহ, বন্যা, নাব্যতা এবং পলি কৃষি ও বসতিতে গভীর প্রভাব ফেলত। ভাটির ক্ষেত্রে এই ধারণা আরও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ নদী ও জলাভূমি ছিল একই সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পদ ও সামরিক অবকাঠামো। ঈসা খাঁর

নৌসামরিক সাফল্য তাই কেবল যুদ্ধপ্রযুক্তির বিষয় নয়; এটি স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনেরও উদাহরণ। (Bhattacharya, 2022)

ঐতিহ্য ব্যবস্থাপনার সাম্প্রতিক গবেষণা এই ঐতিহাসিক আলোচনাকে বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত করে। Sen et al. বাংলাদেশের ঐতিহ্য সংরক্ষণে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ও বস্তুবাদী পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। Hossain contextual heritage management-এর মাধ্যমে সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্যের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছেন। Khan stakeholder management-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। Hasan et al. public education I community engagement-এর ভূমিকা দেখিয়েছেন। Madhury and Sarker ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষের মূল্যায়নে স্থানীয় perception-এর গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। ফলে জঙ্গলবাড়ির ক্ষেত্রে heritage management-এর প্রশ্নটি কেবল প্রত্নতাত্ত্বিক নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিকও। (Sen et al., 2006; Hossain, 2013; Khan, 2020; Hasan et al., 2022; Madhury & Sarker, 2024)

এই সাহিত্যসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হলো 'মূল্য' বা value-এর ধারণা। কোনো ঐতিহাসিক স্থান গবেষকের কাছে archaeological value, স্থানীয় মানুষের কাছে identity value, পর্যটকের কাছে experiential value এবং রাষ্ট্রের কাছে national heritage value বহন করতে পারে। একই স্থানের এসব মূল্য সবসময় একে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। জঙ্গলবাড়ির ক্ষেত্রে ঈসা খাঁর স্মৃতি স্থানীয় গৌরবের উৎস হলেও অতিরঞ্জিত ঐতিহাসিক দাবি গবেষণার নির্ভুলতার সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। তাই heritage interpretation-এ documentary evidence এবং community memory দুটিকেই স্বীকৃতি দিতে হবে, কিন্তু তাদের প্রমাণগত মর্যাদা এক করে দেখা যাবে না। (Aas et al., 2005; Jamal & Stronza, 2009; Poulios, 2014; Seekamp & Jo, 2020)

সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে একটি গবেষণা-শূন্যতা স্পষ্ট হয়। ঈসা খাঁ ও বারো ভূঁইয়া নিয়ে বিদ্যমান কাজের বড় অংশ সামরিক সংঘর্ষ, মুঘল প্রশাসন এবং আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তির সম্পর্ককে কেন্দ্র করে; অন্যদিকে পরিবেশগত ইতিহাস ও heritage studies-এর সাম্প্রতিক কাজ নদী, জলাভূমি, স্থানীয় অংশগ্রহণ এবং স্থায়িত্বের প্রশ্নকে আলাদা আলোচনায় এনেছে। কিন্তু কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়িকে ভাটি অঞ্চলের নদী-হাওর-দুর্গ-রাজনীতি-স্মৃতির সমন্বিত historical landscape হিসেবে বিশ্লেষণ তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। এই গবেষণা সেই সংযোগটি সামনে আনার চেষ্টা করে। একই সঙ্গে এটি জনপ্রিয় 'দ্বিতীয় রাজধানী' ধারণাকে প্রমাণের স্তর অনুযায়ী পুনর্বিবেচনা করে এবং documentary, archaeological I oral-memory evidence-এর পারস্পরিক সম্পর্ককে পদ্ধতিগতভাবে গুরুত্ব দেয়।

৪. গবেষণা-প্রদ্ধতিঃ

এই গবেষণায় ঐতিহাসিক-ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণার তথ্য প্রধানত প্রাথমিক ও গৌণ উৎস থেকে সংগৃহীত।প্রাথমিক উৎসের মধ্যে রয়েছে আবুল ফজলের Akbarnama I Ain-i-Akbari, মির্জা নাথানের Baharistan-i-Ghaibi, রালফ ফিচের ভ্রমণবিবরণ এবং সমকালীন মুঘল প্রশাসনিক ও সামরিক বিবরণ। গৌণ উৎস হিসেবে বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাস, বারো ভূঁইয়া ও ঈসা খাঁ বিষয়ক গবেষণা, কিশোরগঞ্জের জেলা ইতিহাস,উইকিপিডিয়া এবং বাংলাপিডিয়ার সংশ্লিষ্ট নিবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে।জঙ্গলবাড়ির ক্ষেত্রে দুর্গের অবশিষ্ট স্থাপনা, পরিখা, ইটের নিদর্শন, মৃৎপাত্র এবং নদীপথের অবস্থান বিবেচনা করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে প্রচলিত ঈসা খাঁ ও জঙ্গলবাড়ি-সংক্রান্ত লোককাহিনিকেউৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে; তবে লোককথাকে সরাসরি ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি।

এই গবেষণার পদ্ধতি মূলত qualitative historical research। প্রথম ধাপে primary sources শনাক্ত ও শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। দরবারি ইতিহাস, সামরিক বিবরণ, ভ্রমণকাহিনি এবং প্রশাসনিক তথ্যকে পৃথকভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে secondary scholarship ব্যবহার করে ঘটনাগুলোর বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট নির্ধারণ করা হয়েছে। তৃতীয় ধাপে জঙ্গলবাড়ির স্থানিক ও বস্তুগত বৈশিষ্ট্যকে আঞ্চলিক রাজনৈতিক ভূদৃশ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এই তিন ধাপের সমন্বয়ে একটি multi-source historical reconstruction তৈরি করা হয়েছে।

উৎস সমালোচনায় চারটি প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে: উৎসটি কে লিখেছেন, কখন লিখেছেন, কোন উদ্দেশ্যে লিখেছেন এবং তার তথ্যের সীমা কোথায়। উদাহরণস্বরূপ, মুঘল দরবারি উৎসে সাম্রাজ্যের বৈধতা ও কর্তৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি শক্তিশালী হতে পারে। বিপরীতে স্থানীয় লোকঐতিহ্য বহু প্রজন্মের স্মৃতি ধারণ করলেও তার কালনির্ণয় ও ঘটনার নির্ভুলতা সবসময় নিশ্চিত নয়। তাই documentary, archaeological এবং oral evidence-এর riangulation ব্যবহার করা হয়েছে।

জঙ্গলবাড়ির ক্ষেত্রে spatial reading গুরুত্বপূর্ণ। একটি দুর্গের কৌশলগত মূল্য নির্ধারণে শুধু স্থাপনার আকার নয়, আশপাশের নদী, খাল, হাওর, যোগাযোগপথ এবং সম্ভাব্য রসদ পরিবহনের পথ বিবেচনা করা হয়। এই গবেষণায় বর্তমান ভূপ্রকৃতি এবং ঐতিহাসিক বর্ণনার মধ্যে সম্পর্ককে ব্যাখ্যামূলকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ভবিষ্যতে পুরোনো মানচিত্র, cadastral records, satellite imagery এবং GIS analysis যুক্ত করলে spatial reconstruction আরও নির্ভুল হবে।

গবেষণার আরেকটি methodological principle হলো 'negative evidence'-এর সতর্ক ব্যবহার। কোনো উৎসে জঙ্গলবাড়িকে রাজধানী বলা হয়নি বলে সরাসরি প্রমাণ হয় না যে স্থানটি রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বহীন ছিল। একইভাবে লোকঐতিহ্যে রাজধানী বলা হয়েছে বলেই তা নিশ্চিত ঐতিহাসিক সত্য হয়ে যায় না। এই দুই চরম অবস্থার পরিবর্তে প্রমাণের শক্তি অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। তাই 'দ্বিতীয় রাজধানী' নয়, 'গুরুত্বপূর্ণ সামরিক-রাজনৈতিক কেন্দ্র' ধারণাটি গ্রহণ করা হয়েছে।

মানব-অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এই নিবন্ধে নতুন survey, intervie ফল উপস্থাপন করা হয়নি। স্থানীয় লোককাহিনি ও স্মৃতিকে historical-memory evidence হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। যদি ভবিষ্যৎ গবেষণায় নতুন oral history সংগ্রহ করা হয়, তবে informed consent, confidentiality, interviwe protocol Ges institutional ethics approval-এর বিবরণ যুক্ত করা প্রয়োজন| GB বিষয়টি journal-Gi research ethics requirement-এর সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৫. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :

ভূঁইয়া' শব্দটি বাংলার স্থানীয় ভূস্বামী ও রাজনৈতিক ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের বোঝাতে ব্যবহৃত হতো। ষোড়শ শতকে মুঘল সাম্রাজ্য যখন বাংলায় কর্তৃত্ব বিস্তারের চেষ্টা করে, তখন স্থানীয় ভূস্বামীদের একটি অংশ মুঘল প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং অন্য অংশ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ভাটি অঞ্চলের ভূঁইয়ারাই পরবর্তীকালে বারো ভূঁইয়া নামে পরিচিতি লাভ করেন। তবে বারো ভূঁইয়াদের নির্দিষ্ট ১২ সদস্যের একটি স্থায়ী তালিকা ইতিহাসে সব সময় পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানীয় শাসক ও জমিদারের অবস্থান পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে 'বারো' শব্দটি একটি পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক শক্তির ঐতিহ্য হিসেবেও বিবেচ্য।ঈসা খাঁ এই রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে সর্বাধিক প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন।

৬. ভৌগৌলিক অবস্থান:

ঈসা খাঁর বংশপরিচয় নিয়ে ঐতিহাসিক সূত্রে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। বাংলাপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী তাঁর পূর্বপুরুষদের একজন অযোধ্যা অঞ্চল থেকে বাংলায় এসে সুলতানি প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হন। পরবর্তীতে তাঁর পরিবার বাংলার রাজনৈতিক ও ভূস্বামী শ্রেণির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে ওঠে।এই পারিবারিক পটভূমি ঈসা খাঁর রাজনৈতিক উত্থানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ষোড়শ শতকের রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় তিনি এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকে রাজনৈতিক ক্ষমতায় রূপান্তর করতে সক্ষম হন। তিনি স্থানীয় ভূস্বামীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং ভাটি অঞ্চলে নিজের কর্তৃত্ব বিস্তার করেন। সোনারগাঁও তাঁর ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল; পরবর্তীতে লক্ষ্যা নদীর তীরে কাটরাবো তাঁর রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ব পায়। ঈসা খাঁর বংশপরিচয় নিয়ে ঐতিহাসিক সূত্রে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। বাংলাপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী তাঁর পূর্বপুরুষদের একজন অযোধ্যা অঞ্চল থেকে বাংলায় এসে সুলতানি প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হন। পরবর্তীতে তাঁর পরিবার বাংলার রাজনৈতিক ও ভূস্বামী শ্রেণির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে ওঠে।এই পারিবারিক পটভূমি ঈসা খাঁর রাজনৈতিক উত্থানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ষোড়শ শতকের রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় তিনি এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকে রাজনৈতিক ক্ষমতায় রূপান্তর করতে সক্ষম হন।তিনি স্থানীয় ভূস্বামীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং ভাটি অঞ্চলে নিজের কর্তৃত্ব বিস্তার করেন। সোনারগাঁও তাঁর ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল; পরবর্তীতে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে কাটরাবো তাঁর রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ব পায়।

৭. নৌ পথ:

ভাটি অঞ্চলে নৌযান ছিল যোগাযোগ, আক্রমণ, প্রতিরক্ষা ও রসদ পরিবহনের প্রধান মাধ্যম। নদীপথ ব্যবহার করে ঈসা খাঁর বাহিনী দ্রুত এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যেতে, শত্রুর গতিপথ পর্যবেক্ষণ করতে এবং দুর্গে রসদ পৌঁছে দিতে পারত।নৌবাহিনীর ব্যবহার মুঘল স্থলবাহিনীর প্রচলিত যুদ্ধকৌশলকে সীমিত করেছিল। নদী ও জলাভূমির স্থানীয় জ্ঞান ছিল ঈসা খাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সম্পদ। ভাটি অঞ্চলে যুদ্ধের মৌসুমি চরিত্রও গুরুত্বপূর্ণ। বর্ষায় নদী ও জলাভূমি বিস্তৃত হওয়ায় নৌযুদ্ধের সম্ভাবনা বাড়ত, আবার শুষ্ক মৌসুমে কিছু স্থলপথ ও ঘাট অপেক্ষাকৃত সহজে ব্যবহার করা যেত। ফলে সামরিক কৌশলকে ঋতুভিত্তিকভাবে পরিকল্পনা করা সম্ভবত প্রয়োজন ছিল। স্থানীয় বাহিনী এই ৎবধংড়হধষ মবড়মৎধঢ়যু সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিল, যা বাইরের সেনাবাহিনীর জন্য তুলনামূলক অসুবিধা সৃষ্টি করত।

নৌযানের ধরন, নদীর গভীরতা এবং স্রোতের জ্ঞান একটি যুদ্ধের ফল নির্ধারণ করতে পারত। ছোট ও দ্রুত নৌযান নদীর শাখা-প্রশাখায় চলাচলে সুবিধা পেত। বৃহৎ বাহিনী বা ভারী অস্ত্রের পরিবহন অপেক্ষাকৃত কঠিন হতে পারত। এই বাস্তবতা স্থানীয় প্রতিরোধকে

asymmetric advantage প্রদান করেছিল। দুর্গগুলোও বিচ্ছিন্ন স্থাপনা ছিল না। একটি দুর্গের সঙ্গে জলপথ, রসদঘাট, বসতি ও অন্যান্য প্রতিরক্ষা কেন্দ্রের যোগাযোগ থাকলে তা একটি defensive network-এর অংশে পরিণত হয়। জঙ্গলবাড়ির পরিখা ও নদীপথের সম্পর্ক এই ধরনের networked defence-এর সম্ভাবনা নির্দেশ করে। তবে এই ব্যাখ্যাকে নিশ্চিত করতে আরও প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রয়োজন। মুঘলদের সামরিক প্রতিক্রিয়াও সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছিল। সাম্রাজ্যিক বাহিনী স্থানীয় ভূপ্রকৃতির সঙ্গে অভিযোজিত হওয়ার চেষ্টা করে এবং রাজনৈতিক সমঝোতা ও সামরিক অভিযান একসঙ্গে ব্যবহার করে। তাই ঈসা খাঁর প্রতিরোধকে এমন একটি dynamic conflict হিসেবে দেখা উচিত যেখানে উভয় পক্ষই কৌশল পরিবর্তন করছিল।

৮. মুঘলদের সাথে দন্দ্ব :

বাংলায় মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার সঙ্গে ঈসা খাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। মুঘল প্রশাসন পূর্ববাংলার স্থানীয় ভূস্বামীদের কাছ থেকে আনুগত্য ও রাজস্ব আদায় করতে চাইলে ঈসা খাঁ তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেন।শাহবাজ খানসহ মুঘল সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঈসা খাঁর একাধিক সংঘর্ষ হয়। টোক, বাজিতপুর এবং ভাটি অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঈসা খাঁর বাহিনী স্থানীয় ভূগোলের সুবিধা নিয়ে মুঘল বাহিনীর অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত করতে সক্ষম হয়।এই সংঘর্ষগুলো দেখায় যে মুঘল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক শক্তি বিশাল হলেও স্থানীয় ভূপ্রকৃতি ও আঞ্চলিক প্রতিরোধ তাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ ছিল।

৯. জঙ্গলবাড়ি দূগের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও লোকস্মৃতি গুরুত্ব:

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার জঙ্গলবাড়ি বর্তমান বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক স্থান। জঙ্গলবাড়ি দুর্গের অবস্থান নদী ও জলাভূমি-নির্ভর একটি ভূপ্রকৃতির মধ্যে। দুর্গের চারপাশে পরিখা ছিল এবং জলপথের মাধ্যমে নদীর সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল।স্থানীয় ঐতিহ্যে জঙ্গলবাড়ি ঈসা খাঁর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী, ঈসা খাঁ স্থানীয় শাসক লক্ষ্মণ হাজরাকে পরাজিত করে দুর্গটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং পরে এখানে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করেন বলে ঐতিহাসিক সূত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়।তবে দুর্গটির মূল নির্মাণ ঈসা খাঁর সময়েই হয়েছিল্তএমন দাবি নিশ্চিতভাবে করা যায় না। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে ধারণা করা হয় যে তাঁর আগেও এখানে বসতি ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল।জনপ্রিয় ইতিহাস ও স্থানীয় লোকঐতিহ্যে জঙ্গলবাড়িকে অনেক সময় ঈসা খাঁর 'দ্বিতীয় রাজধানী' বলা হয়। তবে আন্তর্জাতিক জার্নালের গবেষণায় এ বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ঐতিহাসিক সূত্রে কাটরাবোকে ঈসা খাঁর রাজধানী হিসেবে বেশি সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়।তাই জঙ্গলবাড়িকে 'দ্বিতীয় রাজধানী' বলার পরিবর্তে 'গুরুত্বপূর্ণ সামরিক-রাজনৈতিক কেন্দ্র' বলা অধিকতর ইতিহাসসম্মত। এতে স্থানীয় ঐতিহ্যের গুরুত্ব অস্বীকার করা হয় না; বরং ঐতিহ্য ও প্রাথমিক ঐতিহাসিক প্রমাণকে পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হয়। জঙ্গলবাড়ির প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দুর্গ এলাকায় ইটের কাঠামো, ইটের খণ্ড, মৃৎপাত্র এবং পুরোনো স্থাপনার চিহ্নের কথা ঐতিহাসিক বিবরণে উল্লেখ পাওয়া যায়। এসব নিদর্শন থেকে ধারণা করা যায় যে ঈসা খাঁর সময়ের পূর্বেও এলাকাটি বসতি ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিল।অতএব, জঙ্গলবাড়ির ইতিহাসকে কেবল ঈসা খাঁর সময় থেকে শুরু করা যাবে না। এখানে প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাসের একটি দীর্ঘ ধারাবাহিকতার দিকে নির্দেশ করে। জঙ্গলবাড়ির ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে তিন ধরনের প্রমাণকে একত্রে বিবেচনা করা প্রয়োজন্তঐতিহাসিক দলিল, প্রত্নতত্ত্ব এবং লোকস্মৃতি। ঐতিহাসিক দলিল রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলি সম্পর্কে তথ্য দেয়; প্রত্নতত্ত্ব বসতি, দুর্গ, স্থাপত্য ও বস্তুগত সংস্কৃতির প্রমাণ দেয়; আর লোকস্মৃতি সমাজের মধ্যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও স্থানের স্মৃতি কীভাবে টিকে আছে তা প্রকাশ করে।

১০.ঈসা খাঁর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব:

ঈসা খাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা শুধু সামরিক শক্তির ওপর নির্ভর করেনি। রাজস্ব সংগ্রহ, ভূস্বামীদের সঙ্গে সম্পর্ক, সৈন্যদের রসদ, নৌবহর পরিচালনা এবং দুর্গ রক্ষণাবেক্ষণ্তএসবই তাঁর ক্ষমতার ভিত্তি ছিল।ঈসা খাঁ ১৫৯৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুসা খাঁ রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যান। তবে ঈসা খাঁর মতো শক্তিশালী নেতৃত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

পরবর্তীতে মুঘল সুবাদার ইসলাম খাঁ চিশতির অভিযানের ফলে ভাটি অঞ্চলের ভূঁইয়া শক্তি ক্রমে মুঘল কর্তৃত্বের অধীন হয়। তবুও ঈসা খাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকার স্থানীয় সমাজে দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং জঙ্গলবাড়ি তাঁর স্মৃতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে টিকে থাকে।জঙ্গলবাড়ি কিশোরগঞ্জের আঞ্চলিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এর রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব পরস্পর সম্পর্কিত। দুর্গের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রতিরক্ষা কাঠামো মধ্যযুগীয় আঞ্চলিক শক্তির সামরিক বাস্তবতা বোঝাতে সাহায্য করে।ঈসা খাঁর বংশধরদের সঙ্গে জঙ্গলবাড়ির সম্পর্ক এবং স্থানীয় লোকঐতিহ্য স্থানটিকে কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত করেছে।বর্তমানে জঙ্গলবাড়ি বাংলাদেশের আঞ্চলিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। কিন্তু প্রত্নস্থানের সংরক্ষণ, গবেষণা, পর্যটন ব্যবস্থাপনা এবং ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগ প্রয়োজন।

জঙ্গলবাড়িকে কেন্দ্র করে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ, পুরোনো স্থাপনার নথিভুক্তকরণ, GIS-ভিত্তিক ঐতিহাসিক মানচিত্র, স্থানীয় মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহ, পুরোনো দলিল ডিজিটাইজেশন এবং সংরক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। এগুলো জঙ্গলবাড়িকে একটি গবেষণা ও ঐতিহ্যভিত্তিক শিক্ষামূলক পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে উন্নয়নে সহায়তা করবে।জঙ্গলবাড়ির ইতিহাসকে অন্তত তিনটি স্তরে দেখা যায়। প্রথম স্তর হলো ঈসা খাঁর পূর্ববর্তী স্থানীয় বসতি ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্ভাব্য ইতিহাস। দ্বিতীয় স্তর হলো ষোড়শ শতকের শেষভাগ ও সপ্তদশ শতকের সূচনায় ভাটি অঞ্চলের সামরিক-রাজনৈতিক ইতিহাস। তৃতীয় স্তর হলো ঈসা খাঁ-পরবর্তী স্মৃতি, লোককাহিনি এবং আধুনিক আঞ্চলিক পরিচয়। এই তিন স্তর আলাদা করলে স্থানটির ইতিহাস আরও পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।ঈসা খাঁর সঙ্গে জঙ্গলবাড়ির সম্পর্ক স্থানীয় ঐতিহ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী। কিন্তু ঐতিহ্যগত স্মৃতি প্রায়ই পরবর্তী সময়ের সামাজিক চাহিদা ও পরিচয়ের সঙ্গে নতুন অর্থ গ্রহণ করে। তাই জঙ্গলবাড়ির 'ঈসা খাঁর দুর্গ' পরিচয়টি historical memory হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর প্রতিটি স্থাপত্যিক উপাদান যে তাঁর আমলের, তা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ ছাড়া বলা উচিত নয়।প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার একটি সম্ভাব্য ক্ষেত্র হলো stratigraphic surve। ইটের আকার, নির্মাণপ্রযুক্তি, মৃৎপাত্রের ধরন, স্থাপত্যের স্তর এবং মাটির নিচের কাঠামো বিশ্লেষণ করলে স্থানটির কালক্রম আরও নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হতে পারে। এই কাজের সঙ্গে documentary history যুক্ত করলে জঙ্গলবাড়ির long-term settlement history পুনর্গঠন করা সম্ভব।স্থানটির landscape character-ও সংরক্ষণের অংশ হওয়া উচিত। শুধু দৃশ্যমান ইট বা স্থাপনা সংরক্ষণ করলে নদী, পরিখা, জলাভূমি এবং ঐতিহাসিক চলাচলের পথ হারিয়ে যেতে পারে। আধুনিক নির্মাণ বা মাটি ভরাটের কারণে landscape পরিবর্তিত হলে দুর্গের সামরিক যুক্তিও অদৃশ্য হয়ে যাবে। তাই conservation boundary নির্ধারণে archaeological remains-এর পাশাপাশি historic landscape বিবেচনা করা প্রয়োজন।

১১. দক্ষিণ এশীয় তুলনামূলক তাৎপর্য:

দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে সাম্রাজ্য ও স্থানীয় শক্তির সম্পর্ক বহুস্তরীয়। মুঘল সাম্রাজ্য তার বিশাল প্রশাসনিক ও সামরিক কাঠামো সত্ত্বেও প্রত্যেক অঞ্চলে একইভাবে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারেনি। ভাটি অঞ্চলের অভিজ্ঞতা দেখায় যে ecological frontier বা জলাভূমি অঞ্চল সাম্রাজ্যিক সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক সমস্যা তৈরি করতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ঈসা খাঁর ইতিহাসকে South Asian frontier history-এর অংশ হিসেবে পড়া যায়।এশিয়ার অন্যান্য নদীবিধৌত অঞ্চলেও স্থানীয় পরিবেশ রাজনৈতিক সংগঠনকে প্রভাবিত করেছে। নদী, বদ্বীপ, পাহাড় ও বনভূমির মতো ভূপ্রকৃতি কখনো যোগাযোগের বাধা, কখনো সম্পদ, আবার কখনো প্রতিরক্ষার সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। বাংলার ভাটি এই বৃহত্তর এশীয় pattern-এর একটি স্বতন্ত্র উদাহরণ, কারণ এখানে নদী ও হাওর রাজনৈতিক ভূদৃশ্যের কেন্দ্রীয় উপাদান।এই তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্ব কমায় না। বরং স্থানীয় ইতিহাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে বৃহত্তর আঞ্চলিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে। ঈসা খাঁর প্রতিরোধ তাই কিশোরগঞ্জ বা পূর্ববাংলার স্থানীয় ঘটনা হয়েও মুঘল সাম্রাজ্যের সীমা, স্থানীয় sovereignty Ges environmental adaptation নিয়ে বৃহত্তর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।এই গবেষণার আলোচনাকে তিনটি পরস্পরসম্পর্কিত স্তরে দেখা যায়-রাজনৈতিক ক্ষমতা, পরিবেশগত ভূদৃশ্য এবং ঐতিহ্যগত স্মৃতি। প্রথমত, ঈসা খাঁর প্রতিরোধকে কেবল মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি ধারাবাহিক সামরিক সংঘর্ষ হিসেবে দেখলে ভাটি অঞ্চলের স্থানীয় রাজনৈতিক বাস্তবতা আড়াল হয়ে যায়। মুঘল প্রশাসন ছিল ভূমি-রাজস্ব, সামরিক সংগঠন এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল; অন্যদিকে ভাটির স্থানীয় শক্তিগুলো নদীপথ, জলাভূমি, মৌসুমি চলাচল এবং বিকেন্দ্রীভূত বসতি-নেটওয়ার্কের উপর নির্ভর করত। ফলে সংঘর্ষটি ছিল দুই ভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক-ভৌগোলিক সংগঠনের মুখোমুখি অবস্থান। এই ব্যাখ্যা পূর্ববাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসকে বৃহত্তর মুঘল রাষ্ট্রবিস্তার ও সীমান্ত-রাজনীতির আলোচনার সঙ্গে যুক্ত করে।

দ্বিতীয়ত, ভাটির পরিবেশকে এখানে নিষ্ক্রিয় পটভূমি হিসেবে নয়, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি সক্রিয় উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। নদীর গতিপথ, নৌযানের উপযোগিতা, বর্ষা ও শুষ্ক মৌসুমের পার্থক্য, পরিখা এবং জলাভূমির পারস্পরিক সম্পর্ক সামরিক চলাচল ও রসদব্যবস্থাকে প্রভাবিত করত। এই অর্থে নৌবাহিনী ছিল শুধু যুদ্ধের একটি উপকরণ নয়; এটি যোগাযোগ, দ্রুত স্থানান্তর, রসদ সরবরাহ এবং দুর্গগুলোর মধ্যে সংযোগ রক্ষার মাধ্যমও ছিল। ভাটি অঞ্চলের রাজনৈতিক অর্থনীতি, কৃষি, মাছ, নৌপরিবহন এবং স্থানীয় বাজারব্যবস্থার সঙ্গে জলপথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় নদী নিয়ন্ত্রণ সামরিক ক্ষমতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতারও অংশ হয়ে উঠতে পারত। পরিবেশগত ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি এই সম্পর্ককে আরও স্পষ্ট করে (Bhattacharya, 2022)।

তৃতীয়ত, জঙ্গলবাড়ির প্রশ্নে প্রমাণের স্তর আলাদা করা জরুরি। স্থানীয় লোকস্মৃতি ও জনপ্রিয় ইতিহাসে জঙ্গলবাড়িকে ঈসা খাঁর 'দ্বিতীয় রাজধানী' বলা হয়; কিন্তু এই দাবির পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রাথমিক দলিল বা প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে নিশ্চিত প্রমাণ সীমিত। তাই গবেষণাটি 'দ্বিতীয় রাজধানী' ধারণার পরিবর্তে 'গুরুত্বপূর্ণ সামরিক-রাজনৈতিক কেন্দ্র' ধারণাকে গ্রহণ করেছে। এই শব্দচয়ন স্থানীয় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে না; বরং ঐতিহ্যগত স্মৃতি ও প্রমাণভিত্তিক ইতিহাসের মধ্যে একটি পদ্ধতিগত ভারসাম্য তৈরি করে। কোনো স্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব নির্ধারণে একটি মাত্র দলিলের অনুপস্থিতিকে গুরুত্বহীনতার প্রমাণ হিসেবে এবং একটি লোককাহিনিকে চূড়ান্ত ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে-দুইভাবেই ব্যবহার করা উচিত নয়। বরং documentary, archaeological Ges oral evidence-Gi triangulation অধিকতর নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি।

চতুর্থত, জঙ্গলবাড়ির ইতিহাসকে একটি দীর্ঘমেয়াদি **historical landscape** হিসেবে দেখা প্রয়োজন। প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ যদি ঈসা খাঁর সময়ের আগের বসতি বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ইঙ্গিত দেয়, তবে স্থানটির ইতিহাসকে কেবল ষোড়শ শতকের শেষভাগে সীমাবদ্ধ করা যাবে না। একইভাবে ঈসা খাঁ-পরবর্তী লোকস্মৃতি, সামাজিক পরিচয় এবং আঞ্চলিক গৌরবও স্থানটির বর্তমান অর্থ নির্মাণ করেছে। ফলে জঙ্গলবাড়ির ইতিহাসের অন্তত তিনটি স্তর-ঈসা খাঁ-পূর্ব বসতি ও কর্মকাণ্ড, ভাটি অঞ্চলের ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের সামরিক-রাজনৈতিক ইতিহাস, এবং পরবর্তী স্মৃতি ও আধুনিক ঐতিহ্যচর্চা-একসঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

পঞ্চমত, দক্ষিণ এশিয়ার তুলনামূলক প্রেক্ষাপটে এই গবেষণার তাৎপর্য হলো বপড়ষড়মরপধষ ভৎড়হঃরবৎ ধারণাকে আঞ্চলিক রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করা। নদী, দ্বীপ, পাহাড় বা বনভূমি বিভিন্ন অঞ্চলে কখনও যোগাযোগের বাধা, কখনও সম্পদ, আবার কখনও প্রতিরক্ষার সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। ভাটির বৈশিষ্ট্য হলো-এখানে নদী ও হাওর একই সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পদ, যোগাযোগব্যবস্থা এবং সামরিক অবকাঠামোর অংশ ছিল। ফলে স্থানীয় রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে সাম্রাজ্যিক শক্তির সম্পর্ককে শুধু কেন্দ্র-প্রান্তের দ্বৈততায় ব্যাখ্যা না করে পরিবেশ, চলাচল, স্থানীয় নেটওয়ার্ক এবং আলোচনাভিত্তিক ক্ষমতার সম্পর্ক হিসেবেও দেখা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি দক্ষিণ এশীয় **frontier history** কে আরও বহুস্তরীয় করে।

ষষ্ঠত, গবেষণার **heritage dimension** একটি গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক প্রয়োগক্ষেত্র তৈরি করে। জঙ্গলবাড়িকে সংরক্ষণ করতে হলে শুধু দৃশ্যমান ইটের স্থাপনা বা পরিখার অবশিষ্টাংশ রক্ষা যথেষ্ট নয়। নদী, জলাভূমি, পরিখা, পুরোনো চলাচলের পথ এবং আশপাশের বসতির সঙ্গে সম্পর্কিত **historic landscape**-ও সংরক্ষণের আওতায় আনতে হবে। **Sen et al. (2006), Hossain (2013), Khan (2020), Hasan et al. (2022) Ges Madhury and Sarker (2024)**-এর আলোচনায় **heritage conservation**-এর ক্ষেত্রে স্থানীয় অংশগ্রহণ, **stakeholder management, contextual interpretation Ges community perception**-এর গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছে। জঙ্গলবাড়ির ক্ষেত্রেও এই নীতিগুলো প্রাসঙ্গিক।

সবশেষে, **heritage sustainability** কে কেবল সংরক্ষণ ব্যয় বা পর্যটন উন্নয়নের প্রশ্ন হিসেবে দেখা উচিত নয়। **documentation, institutional capacity, community benefit, environmental protection** এবং **climate resilience**-এই উপাদানগুলো একত্রে কাজ করলেই দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব সম্ভব। **Aas et al. (2005) Ges Jamal and Stronza (2009) stakeholder collaboration**-এর গুরুত্ব দেখিয়েছেন; **Poulios (2014) living heritage approach-Gi** মাধ্যমে ঐতিহ্যকে চলমান সামাজিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করেছেন; **Seekamp and Jo (2020)** পরিবর্তনশীল জলবায়ুতে **heritage resilience**-এর প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছেন। জঙ্গলবাড়ির জন্য তাই একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রয়োজন, যেখানে প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, স্থানীয় সমাজ, পরিবেশ এবং দায়িত্বশীল পর্যটন পরস্পরের পরিপূরক হবে।

গবেষণাটির সীমাবদ্ধতাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। জঙ্গলবাড়ির স্থাপত্য, পরিখা, নদীপথ ও প্রত্ননিদর্শন সম্পর্কে এখানে উপলব্ধ তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে; কিন্তু পূর্ণাঙ্গ **archaeological excavation, stratigraphic survey, radiocarbon dating, GIS-based historical reconstruction** বা নতুন **oral-history fieldwork** এই গবেষণার প্রত্যক্ষ পরিধিতে সম্পন্ন হয়নি। ফলে জঙ্গলবাড়ির নির্দিষ্ট নির্মাণকাল, স্থাপত্যের প্রতিটি পর্যায় এবং ঈসা খাঁর সঙ্গে প্রতিটি স্থাপত্যিক উপাদানের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব নয়। একইভাবে স্থানীয় লোককথার ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে, কিন্তু এর কালনির্ধারণ ও বর্ণনাগত পরিবর্তন যাচাই করতে আরও পরিকল্পিত **oral-history research** প্রয়োজন। এই সীমাবদ্ধতা গবেষণার সিদ্ধান্তকে দুর্বল করার পরিবর্তে ভবিষ্যৎ গবেষণার নির্দিষ্ট ক্ষেত্র নির্দেশ করে।

ভবিষ্যৎ গবেষণায় অন্তত চারটি কাজ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, জঙ্গলবাড়ি ও আশপাশের প্রত্নস্থানের পূর্ণাঙ্গ **survey** করে স্থাপত্যিক অবশেষের **spatial database** তৈরি করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, পুরোনো মানচিত্র, **cadastral records**, রাজস্ব নথি এবং আধুনিক **satellite imagery** একত্রে ব্যবহার করে ঐতিহাসিক নদীপথ ও বসতি-নেটওয়ার্ক পুনর্গঠন করা যেতে পারে। তৃতীয়ত, জঙ্গলবাড়ি, সোনারগাঁও, কাত্রাবো এবং ভাটি অঞ্চলের অন্যান্য সামরিক কেন্দ্রের তুলনামূলক গবেষণা করলে ঈসা খাঁর রাজনৈতিক নেটওয়ার্ক সম্পর্কে অধিকতর নির্ভুল ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে। চতুর্থত, স্থানীয় প্রবীণ জনগোষ্ঠীর **oral history** সংগ্রহ করে প্রতিটি বয়ানের উৎস, সময়, সামাজিক অবস্থান এবং পরিবর্তিত স্মৃতির ধরন নথিভুক্ত করা দরকার। এ ধরনের গবেষণায় **informed consent, confidentiality** এবং গবেষণা-নৈতিকতার মানদণ্ড অনুসরণ করা আবশ্যক।

এই প্রবন্ধের মৌলিক অবদান তাই কোনো নতুন সামরিক ঘটনার দাবি প্রতিষ্ঠা করা নয়; বরং বিদ্যমান ইতিহাস, ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব ও ঐতিহ্যচর্চাকে একটি সমন্বিত বিশ্লেষণাত্মক কাঠামোর মধ্যে আনা। ঈসা খাঁর প্রতিরোধকে **environmental adaptation, regional political network Ges heritage landscape**-এর সঙ্গে যুক্ত করে দেখা হলে ভাটি অঞ্চলের ইতিহাসকে জাতীয় ইতিহাসের একটি 'প্রান্তিক' অধ্যায় হিসেবে নয়, বরং রাষ্ট্রবিস্তার, স্থানীয় ক্ষমতা এবং পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে পুনর্বিবেচনা করা যায়। জঙ্গলবাড়ির ক্ষেত্রেও একই দৃষ্টিভঙ্গি প্রযোজ্য: এটি শুধু একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ নয়, বরং নদী-হাওর-দুর্গ-বসতি-স্মৃতির একটি জটিল ঐতিহাসিক ভূদৃশ্য।

সুতরাং, জঙ্গলবাড়ির ঐতিহাসিক মূল্যায়নে সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো একক ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্মৃতি থেকে সরে গিয়ে **landscape-centred historical analysis** গ্রহণ করা। এতে ঈসা খাঁর নেতৃত্ব, বারো ভূঁইয়ার পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক কাঠামো, ভাটির জলভূমি, নৌসামরিক কৌশল এবং স্থানীয় স্মৃতি-সবকিছুকে একই বিশ্লেষণাত্মক পরিসরে আনা যায়। এই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গিই ভবিষ্যৎ আঞ্চলিক ইতিহাস ও **heritage studies**-এর জন্য একটি কার্যকর গবেষণা-ভিত্তি তৈরি করতে পারে।

জঙ্গলবাড়ির **heritage sustainability**-কে শুধু সংরক্ষণ নয়, আন্তঃপ্রজন্মীয় দায়িত্ব হিসেবে দেখা উচিত। একটি **heritage site** তখনই টেকসই হয় যখন তার বস্তুগত উপাদান, ঐতিহাসিক অর্থ, স্থানীয় সামাজিক সম্পর্ক এবং পরিবেশগত ভিত্তি দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকে। **Roders-Gi sustainable heritage discourse Ges Poulios-Gi living heritage approach** এই সমন্বিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রথম স্তর হবে **documentation sustainability**। জঙ্গলবাড়ির প্রতিটি দৃশ্যমান ও সম্ভাব¨ **archaeological feature-Gi digital record** তৈরি করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় স্তর হবে **institutional sustainability** সংরক্ষণ করবে, কীভাবে অর্থায়ন হবে, কীভাবে **monitoring** হবে এবং ক্ষতি হলে কে দ্রুত ব্যবস্থা নেবে তা নির্ধারণ করতে হবে। তৃতীয় স্তর হবে **social sustainability** স্থানীয় জনগণ যেন **heritage protection**-এ নিজেদের স্বার্থ দেখতে পায়।

চতুর্থ স্তর হবে **environmental sustainability**। জঙ্গলবাড়ির জলাভূমি ও নদীপ্রবাহকে **heritage context**-এর অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। মাটি ভরাট, জলপথ বন্ধ, অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ ঐতিহাসিক **landscape** ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাই **conservation plan**-এ **environmental impact assessment**-এর নীতি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

পঞ্চম স্তর হবে **economic sustainability**। স্থানীয় মানুষ যদি **heritage tourism** থেকে বৈধ ও ন্যায্য আয় করতে পারে, তাহলে **site protection**-এর সামাজিক ভিত্তি শক্তিশালী হতে পারে। স্থানীয় **guide, craft, food service, cultural interpretation** এবং শিক্ষামূলক **tourism**-এর সুযোগ তৈরি করা যেতে পারে। তবে **commercialisation** যেন ঐতিহাসিক স্থানের **authenticity** ও স্থানীয় জীবনের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি না করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

সপ্তমত, **climate resilience** পরিকল্পনা প্রয়োজন। নদীর গতিপথ, অতিবৃষ্টি, বন্যা ও মাটির ক্ষয় ঐতিহাসিক স্থানের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। **Seekamp and Jo**-এর **resilience framework AbymiY** করে **periodic risk assessment, emergency documentation Ges adaptive management**-এর ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। এভাবে সংরক্ষণ হবে **static** নয়, **adaptive**।

১২. সুপারিশিসমূহঃ

১. প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নেতৃত্বে জঙ্গলবাড়ির পূর্ণাঙ্গ **archaeological and historical survey** পরিচালনা করা।

২. **GIS** ও **historical map** ব্যবহার করে **Jangalbari-Bhati historical landscape map** তৈরি করা।

৩. স্থানীয় মানুষ, শিক্ষক, গবেষক, প্রশাসন ও সাংস্কৃতিক সংগঠনকে নিয়ে একটি **stakeholder forum** গঠন করা।

৪. **site museum ev interpretation centre** স্থাপন করে **documentary evidence** ও **oral tradition** পৃথকভাবে উপস্থাপন করা।

৫. স্কুল-কলেজের জন্য স্থানীয় ইতিহাসভিত্তিক **heritage education programme** চালু করা।

৬. প্রশিক্ষিত স্থানীয় **guide** ও **community-based tourism**-এর ব্যবস্থা করা, যাতে পর্যটনের অর্থনৈতিক সুফল স্থানীয় পর্যায়ে থাকে।

৭. **visitor management, waste management, sanitation Ges emergency response**-এর লিখিত পরিকল্পনা তৈরি করা।

৮. নদী, পরিখা ও জলাভূমির ষধহফংপধঢ়ব পযধৎধপঃবৎ রক্ষায় উন্নয়ন প্রকল্পের আগে **heritage impact assessment** চালু করা।

৯. **oral-history archive** তৈরি করে প্রবীণ স্থানীয় বাসিন্দাদের স্মৃতি সংরক্ষণ করা; তবে প্রতিটি বয়ানের উৎস ও তারিখ নথিভুক্ত করা।

১০. প্রতি পাঁচ বছরে **conservation management** ঢ়ষধহ পর্যালোচনা করা এবং নতুন **archaeological** বা **environmental evidence** অনুযায়ী তা হালনাগাদ করা।

১৩. গবেষণার ফলাফল :

১. ঈসা খাঁর রাজনৈতিক সাফল্য ব্যক্তিগত সামরিক দক্ষতার পাশাপাশি ভাটি অঞ্চলের পরিবেশ, নৌসামরিক সক্ষমতা ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

২. বারো ভূঁইয়া একটি সম্পূর্ণ স্থির বারোজনের সংগঠন হিসেবে নয়, পরিবর্তনশীল আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তির ঐতিহাসিক পরিচয় হিসেবে অধিকতর কার্যকরভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

৩. নদী, হাওর ও জলাভূমি ভাটি অঞ্চলের রাজনৈতিক ভূগোলের সক্রিয় উপাদান ছিল।

৪. জঙ্গলবাড়ির সামরিক গুরুত্ব তার নদী-জলাভূমি-দুর্গ সম্পর্কের মধ্যে নিহিত।

৫. জঙ্গলবাড়িকে 'দ্বিতীয় রাজধানী' বলার জন্য আরও শক্তিশালী প্রাথমিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ প্রয়োজন; 'সামরিক-রাজনৈতিক কেন্দ্র' ধারণাটি বর্তমানে অধিকতর নিরাপদ।

৬. জঙ্গলবাড়ির ইতিহাস ঈসা খাঁর সময়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী স্তরসমূহসহ একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক ভূদৃশ্য হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৭. স্থানীয় লোকস্মৃতি ঐতিহাসিক পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলেও তা ফড়পঁসবহঃধৎু বারফবহপব-এর বিকল্প নয়।

৮. **heritage sustainability**-এর জন্য **archaeology, local community, environment, education** এবং **responsible tourism**-কে একীভূত করা প্রয়োজন।

১৪. উপসংহার:

বাংলার বারো ভূঁইয়া ইতিহাস মুঘল সাম্রাজ্য ও স্থানীয় রাজনৈতিক শক্তির সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ঈসা খাঁর নেতৃত্বে ভাটি অঞ্চলের প্রতিরোধ দেখায় যে সাম্রাজ্যিক ক্ষমতার বিস্তার কোনো সরল ও একমুখী প্রক্রিয়া ছিল না। নদী, জলাভূমি, নৌযান, দুর্গ এবং স্থানীয় সামাজিক নেটওয়ার্ক সাম্রাজ্যিক শক্তির বিরুদ্ধে আঞ্চলিক প্রতিরোধের বাস্তব অবকাঠামো তৈরি করেছিল। এই অর্থে ভাটি একটি বপড়ষড়মরপধষ ভৎড়হঃরবৎ, যেখানে পরিবেশ ও রাজনীতি পরস্পরকে নির্মাণ করেছে।

জঙ্গলবাড়ি এই বৃহত্তর ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এর ভৌগোলিক অবস্থান, পরিখা, জলপথ এবং স্থানীয় ঐতিহ্য এটিকে সামরিক-রাজনৈতিক ভূদৃশ্যের অংশ করে। তবে গবেষণার দায়িত্ব হলো জনপ্রিয় স্মৃতি ও প্রাথমিক প্রমাণের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করা। জঙ্গলবাড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে নিশ্চিত করার বদলে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক-রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা বর্তমানে অধিকতর ইতিহাসসম্মত। একই সঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ভবিষ্যতে এই ব্যাখ্যাকে আরও শক্তিশালী বা সংশোধন করতে পারে।

এই গবেষণার বৃহত্তর অবদান হলো আঞ্চলিক ইতিহাসকে পরিবেশগত ইতিহাস ও **heritage studies**-এর সঙ্গে যুক্ত করা। ঈসা খাঁর রাজনৈতিক প্রতিরোধ শুধু অতীতের যুদ্ধের ইতিহাস নয়; এটি নদী ও রাষ্ট্র, স্থানীয় ক্ষমতা ও সাম্রাজ্য, স্মৃতি ও প্রমাণ, এবং ঐতিহ্য ও উন্নয়নের সম্পর্ক নিয়ে বর্তমান গবেষণার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। জঙ্গলবাড়ির টেকসই সংরক্ষণ তাই অতীতকে 'স্থির' করে রাখার প্রকল্প নয়; বরং অতীতের বস্তু, স্মৃতি ও পরিবেশকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দায়িত্বশীলভাবে বহন করার একটি সামাজিক প্রক্রিয়া।

শেষ পর্যন্ত জঙ্গলবাড়িকে কিশোরগঞ্জের একটি **isolated monument** হিসেবে নয়, ভাটি অঞ্চলের বিস্তৃত নদী-হাওর-দুর্গ-জনবসতি **network**-এর অংশ হিসেবে দেখা প্রয়োজন। এই **perspective** ভবিষ্যৎ গবেষণায় **GIS, archaeology, environmental history, oral history Ges heritage management**-এর সমন্বিত ব্যবহারকে উৎসাহিত করবে। বাংলাদেশের আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চায় এ ধরনের **interdisciplinary approach** জাতীয় ইতিহাসকে আরও বহুমাত্রিক ও প্রমাণনির্ভর করে তুলতে পারে।

গবেষণার নতুনত্ব ও অবদান

এই নিবন্ধের নতুনত্ব তিনটি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমত, ঈসা খাঁর রাজনৈতিক প্রতিরোধকে শুধু সামরিক ইতিহাসের কাঠামোয় সীমাবদ্ধ না রেখে নদী-জলাভূমির পরিবেশগত ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এতে ভাটি অঞ্চলের ভূগোলকে **passive background** না ধরে **political agency**-এর একটি উপাদান হিসেবে দেখা সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয়ত, জঙ্গলবাড়ির ক্ষেত্রে ঢ়ড়ট্ঁষধৎ সবসড়ৎু এবং ফড়গঁসবহঃধৎু বারফবহপব-এর মধ্যে পার্থক্য বজায় রেখে একটি **balanced historical interpretation** প্রস্তাব করা হয়েছে। তৃতীয়ত, মধ্যযুগীয় আঞ্চলিক ইতিহাসকে বর্তমান **heritage sustainability**-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ফলে নিবন্ধটি একই সঙ্গে **historical scholarship** এবং **contemporary heritage** ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক।

এই গবেষণার ফল জাতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের ইতিহাস দীর্ঘদিন ধরে রাজধানীকেন্দ্রিক ও রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বয়ানে উপস্থাপিত হলেও আঞ্চলিক ইতিহাস দেখায় যে রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থানীয় সমাজ ও পরিবেশের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত ছিল। কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, সোনারগাঁও ও ভাটি অঞ্চলের মতো স্থানগুলোকে জাতীয় ইতিহাসের প্রান্ত নয়, বরং ইতিহাসের সক্রিয় নির্মাতা হিসেবে দেখা প্রয়োজন। এই দৃষ্টিভঙ্গি ভবিষ্যৎ গবেষণায় **microhistory, environmental history** এবং **connected regional history**-এর নতুন সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে।

ভবিষ্যৎ গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হবে জঙ্গলবাড়ি ও আশপাশের প্রত্নস্থানগুলোর **comparative study**। যদি নদীপথ, দুর্গ, বাজার, বসতি এবং স্থানীয় প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলোর একটি **spatial database** তৈরি করা যায়, তাহলে ভাটি অঞ্চলের রাজনৈতিক **network**-এর একটি অধিক নির্ভুল চিত্র পাওয়া সম্ভব হবে। একই সঙ্গে পুরোনো মানচিত্র, রাজস্ব নথি, জমিদারি দলিল, প্রত্নতাত্ত্বিক **survey** এবং **oral history** একত্রে ব্যবহার করলে ঈসা খাঁ-পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক পরিবর্তনও আরও গভীরভাবে বোঝা যাবে

তথ্যসূত্র

বাংলা একাডেমি আধুনি বাংলা অভিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমি , পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০১৬)।

বাংলাপিডিয়া , বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, খন্ড ২ (ঢাকা: কালার স্যলিউশন লি., দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১১), পৃ. ৮০-৮২।

বাংলাপিডিয়া , বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, খন্ড ৯ (ঢাকা: কালার স্যলিউশন লি., দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১১), পৃ.২৫৯-২৬১।

মুঘল আমল , উইকিপিডিয়া

আব্দুল করিম , বাংলার ইতিহাস মোগল আমল প্রথম খন্ড, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী ৩য় সংস্কার-২০২০

Abdul Karim. (1992). History of Bengal: Mughal period. Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi.

Abu'l-Fazl. (1877). The Akbarnama of Abu'l-Fazl. Asiatic Society of Bengal.

Aas, C., Ladkin, A., & Fletcher, J. (2005). Stakeholder collaboration and heritage management. Annals of Tourism Research, 32(1), 28–48. https://doi.org/10.1016/j.annals.2004.04.005

Banglapedia. (n.d.). Bara-Bhuiyans, The; Isa Khan; Jangalbari Fort. Asiatic Society of Bangladesh.

Bhattasali, N. K. (1928–1929). Bengal chiefs' struggle for independence in the reign of Akbar and Jahangir. Bengal Past and Present, 35–38.

Bhattacharya, U. (2022). Floods, aridity and rivers: An environmental history of pargana Mandalghat in eighteenth-century Bengal. The Indian Economic & Social History Review, 59(3). https://doi.org/10.1177/00194646221109299

Eaton, R. M. (1996). The rise of Islam and the Bengal frontier, 1204–1760. University of California Press.

Hasan, M. H., Chowdhury, M. A., & Wakil, M. A. (2022). Community engagement and public education in northwestern part of Bangladesh: A study regarding heritage conservation. Heliyon, 8(3), e09005. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09005

Huq, F. F., Akter, R., Hafiz, R., Mamun, A. A., & Rahman, M. (2017). Conservation planning of built heritages of Old Dhaka, Bangladesh. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 7(3), 244–271. https://doi.org/10.1108/JCHMSD-08-2014-0030

Jamal, T., & Stronza, A. (2009). Collaboration theory and tourism practice in protected areas: Stakeholders, structuring and sustainability. Journal of Sustainable Tourism, 17(2), 169–189. https://doi.org/10.1080/09669580802495741

Khan, M. M. H. (2020). Role of stakeholders in heritage management in Bangladesh: A case study of Mahasthangarh. CenRaPS Journal of Social Sciences, 2(3), 354–372. https://doi.org/10.46291/cenraps.v2i3.40

Madhury, M., & Sarker, L. (2024). Heritage values and community perception: A look into the historic ruins of Dinajpur Rajbari. Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning, 23(1), Article 401. https://doi.org/10.54028/NJ202423401

Nathan, M. (1936). Baharistan-i-Ghaibi (M. I. Borah, Trans.). Government of Assam.

Poulios, I. (2014). Discussing strategy in heritage conservation: Living heritage approach as an example of strategic innovation. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 4(1), 16–34. https://doi.org/10.1108/JCHMSD-10-2012-0048

Rahim, M. A. (1963). The history of the Afghans in India. Oxford University Press.

Richards, J. F. (1993). The Mughal Empire. Cambridge University Press.

Seekamp, E., & Jo, E. (2020). Resilience and transformation of heritage sites to accommodate for loss and learning in a changing climate. Climatic Change, 162, 41–55. https://doi.org/10.1007/s10584-020-02812-4

Sen, S., Imran, M., Khan, A., Rahman, M., Kabir, N., Sakeb, N., Islam, K. M., & Rahman, A. (2006). We can protect our past? Re-thinking the dominating paradigm of preservation and conservation with reference to the world heritage site of Somapura Mahavihara, Bangladesh. Journal of Social Archaeology, 6(1), 71–99. https://doi.org/10.1177/1469605306060563